মা ল য়ে শি য়া

সাকাচৌ বনাম জনশক্তি

গায়ে মানে না আপনা মোড়ল অথবা ঢাল নেই তলোয়ার নেই দাদা নিধিরাম সর্দার। উপরোক্ত প্রবাদ বাক্য দুটির সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যাবে আমাদের সদ্য পরাজিত ও আইসি মহাসচিব প্রার্থী সাকা চৌধুরীর। সঙ্গে সরকারের কি লাভ হলো তা অন্তত দেশের সাধারণ জনগণ বুঝতে পারেনি এবং তারা বুঝতেও চায় না এমন যুক্তিহীন কর্মকান্ডের। লাভ না হোক ক্ষতি যেটুকু হবার তা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। নির্বাচনী ক্যাম্পেনিংয়ে দেশ-বিদেশের বড় বাবুদের তেল মর্দনে গেছে ৩০ কোটি টাকা (পত্রপত্রিকার সূত্র মতে)। পদটির জন্য তুরস্ক ও বাংলাদেশের সঙ্গে মালয়েশিয়াও প্রার্থী ঘোষণা করে। বিগত ১ বছর ধরে মালয়েশিয়া বাংলাদেশকে প্রার্থী প্রত্যাহারের অনুরোধ করে। কিন্তু কে শোনে কার কথা।

এদিকে যে ৫০ হাজার বাংলাদেশী শ্রমিক নিয়োগের আশ্বাস মালয়েশিয়া বাংলাদেশকে দিয়েছিল তার আর হয়তো কোনো গতি হবে না। সাকাচৌ অথবা সরকারের হাতে নির্দিষ্ট কোনো পরিসংখ্যান নেই যে কত লাখ লোক আদম ব্যাপারিদের হাতে ভিটে মাটি বিক্রি করা টাকা তুলে দিয়েছেন। তীর্থের কাকের মতো অবস্থা তাদের। কিন্তু দালালরাই বা কি করবেন। তাদের কি করার আছে? যেখানে পুরো সিস্টেমটা স্থগিত সেখানে তাদের তো করার কিছুই থাকে না। বেশ কয়েক মাস আগে শুনেছিলাম যে কোনো এক ভবন থেকে বড় অঙ্কের উপরি দাবি করায় রিক্রুটিং এজেন্সিরা পিছিয়ে গেছে।

আমি গত ২০ এপ্রিল দেশ থেকে ছুটি শেষ করে এলাম। দেশে বেকারদের যে কি অবস্থা তা ভাষায় বর্ণনার অতীত। দেশে থাকাকালীন যেখানেই বেড়াতে গেছি যদি কেউ শোনে যে মালয়েশিয়া থেকে এসেছি নড়েচড়ে ঘুরেফিরে একটি প্রশ্নের মুখোমুখি অধিক পরিমাণ হয়েছি। তা হচ্ছে কলিংয়ের কি খবর? মালয়েশিয়ায় লোক কবে নাগাদ যেতে পারবে? এমনই সব প্রশ্ন। এসব প্রশ্নকর্তাদের মধ্যে অনেক পেশাজীবীও ছিলেন। স্কুলে পড়াকালীন এক কোচিং সেন্টারে যেতাম। সেখানে ব্রিলিয়ান্ট এক বড়ভাই পড়াতেন। বর্তমানে তিনি একটি মাধ্যমিকের শিক্ষক। রাস্তায় দেখা হতে সালাম দিলাম। আমাকে অবাক করে দিয়ে তিনি বললেন, আমাদেরও নিয়ে যাও তোমাদের কাছে। কৌতূহলবশত জিজ্ঞাসা করলাম এমন করে বললেন কেন? তার উত্তর, আর চলে না ৪৮০০ টাকায় সংসার। জানতে পারলাম তিনিও এক দালালের কাছে জিম্মি আছেন। এমন হাজার হাজার নয়, আবার মনে হয় লাখ লাখ ছেলে দালালের মাধ্যমে টাকা-পয়সা জমা দিয়ে বসে আছেন। তাদের কি হবে? কিই বা তাদের ভবিষ্যৎ? এতে কি সাকাচৌদের কিছু হবে নাকি সরকারের কিছু হবে? তবে হ্যাঁ সাকাদের কিছু না হলেও সরকারের এর জন্য মূল্য দিতে হবে। যে ফ্যামেলি থেকে ১ জন মালয়েশিয়া আসার জন্য প্রতারিত হতে চলেছেন সেই ফ্যামিলির প্রতিটি সদস্যই সরকারের ওপর ক্ষিপ্ত। সর্বশেষ সরকারের উচিত হবে সাকাদের ত্যাগ করে জনগণের পাশে এসে দাঁড়ানো। এবং শিগগিরই যেকোনোভাবেই হোক মালয়েশিয়ার সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করে জনশক্তি রপ্তানির ব্যবস্থা করা। ভুলে গেলে চলবে না যে জনসম্পদই বর্তমানে আমাদের বড় সম্পদ। যেটা কিনা ইন্ডিয়া পুরোপুরি কাজে লাগাচ্ছে।

Monirul Islam (moni)
No-112, Selat Selatar, Pandamaran-42000-12, Port Klang, Malaysia

কো রি য়া

কেমন আছি আমরা!

আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধ্বংসের কয়েক দিন পর যেকোনো এক কারণে সাপ্তাহিক ২০০০ সম্পাদক শাহাদত চৌধুরীর কাছে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে ফোন করেছিলাম। তিনি ফোন ধরেই উৎকণ্ঠার স্বরে আমাকে ত্বরিত জিজ্ঞাসা করছিলেন- কোরিয়ায় আমরা কেমন আছি? কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো? তৎক্ষণাৎ চৌধুরী সাহেবের উৎকণ্ঠার কারণ বুঝতে দেরি হলেও আরো দু-একটা কথা বলে বুঝতে পারছিলাম টুইন টাওয়ার ঘটনায় বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মতো দক্ষিণ কোরিয়ার মতো ধর্মহীন রাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশীরা ঝামেলামুক্ত আছি কি না? সত্যি মগ্ন হয়েছিলাম প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রতি সাপ্তাহিক ২০০০ সম্পাদক শাহাদত চৌধুরীর উৎকণ্ঠিত আওয়াজে। আর হ্যাঁ, সম্পাদক সাহেবকে আমি আশ্বস্ত করতে পেরেছিলাম যে, টুইন টাওয়ারের সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় দক্ষিণ কোরিয়ায় আমাদের কোনো বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির স্বীকার হতে হচ্ছে না। টুইন টাওয়ার ঘটনার ২ বছর পর সম্প্রতি ইরাকে বিদ্রোহীদের হাতে দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিক কিম সুন ইলোর (৩০) শিরশ্ছেদ ঘটনায় কোরিয়ায় অবস্থানরত মুসলমানরা এক ভীতিকর অবস্থায় আছি। বিভিন্ন স্থানে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানীদের ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। বাংলাদেশীদের হাতে গড়া ঐতিহ্যবাহী আনিয়া মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে বের হওয়ার সময় দাড়ি-টুপিওয়ালাসহ ১৫ জন বাংলাদেশীকে ইমিগ্রেশন পুলিশ আটক করেছে। বাংলাদেশী অধুষিত আনছান ডং ইয়াং টাওয়ার সংলগ্ন মসজিদে নামাজ পড়া বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। রাজধানী সিউলের দূতাবাসপাড়ায় অবস্থিত ইথিওয়ান মসজিদটি বিপুলসংখ্যক পুলিশ দিয়ে ঘেরাও করে রাখলেও মুসল্লির সংখ্যা অতি নগণ্য। কিছু দিন আগে জাপানে ৫ জন বাংলাদেশীকে আল-কায়েদার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তার করার পর কোরিয়ার গণমাধ্যমে এ গুরুত্বও ফলাও করে প্রচার করে। এতে বাংলাদেশীদের ওপর কোরিয়ানদের সন্দেহ প্রবল আকার ধারণ করে। কর্মক্ষেত্রে প্রবাসী বাংলাদেশীরা মোটেও ঝামেলামুক্ত নয়। আসছে আগস্টে কোরিয়ার নতুন পার্লামেন্ট ইপিএস পাসের মাধ্যমে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশ থেকেও কিছু জনশক্তি নিয়োগের সম্ভাবনা ছিলো। সাম্প্রতিককালের ঘটনাগুলোতে সে আশা এখন গুড়ে বালি। জনশক্তি রপ্তানি সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ থেকে দক্ষিণ কোরিয়ায় মন্ত্রী-এমপিরা এসে অর্থ এবং সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু নয়। সংখ্যাটি কেউ পাঠালে বন্ধুত্বের সম্পর্ক হবে আশা করি।

মোরশেদ আলম (প্রিন্স), **Taelim Air Devices & Enginee Ring co Ltd, 668-1, Gungyong Ri, Dochouck- Myun, Kwangju-Gun, Kyunggi Do 464-880, South Korea. Ph- 016-9217-1298**

নিউইয়র্ক

ফাদার্স ডে

Father`s day. বাৎসরিক পিতৃ দিবস। ঘটা করে জনকের পরিচয়ের অন্তত একটা দিন।

বাঙালির বার মাসে তের পার্বণ।

মার্কিনিদের অন্তত অতটাই নেই। আছে হাতে গোনা, যা কিনা কেনাকাটার জন্য সাজানো। অদ্ভুত দুপুর, খামাখা রোদ যেন তেন করে ঠিকরে পড়ছে আজকে। দুদিন কোথায় ছিল জানা নেই। আজ আছে কাল নেই। বাতাসও বইছে ভারি মিষ্টি মধুর। মনটা কেন যেন অকারণে চঞ্চল।

সুরভী বসে আছে নিউইয়র্ক শহরের মাটির বুক চিরে বেরিয়ে যাওয়া ট্রেন ধরার জন্য। ট্রেনগুলোতে এখন ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ানোর জায়গাও মেলে না। তেলের যুদ্ধে জোর করে তেল মেলাতে পারেনি। ঝঞ্ঝাটটা আরও বেড়েছে। মধ্যবিত্তের জীবনেও এসে ঠেকেছে কঠোর বৈকুন্ঠের হিসাব। তাই সাধ থাকলেও টয়োটা, করোলা চালানোর বাহারি সাধ্য ছেড়ে এই পাবলিক ট্রেনে চড়তে হচ্ছে। ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই অবস্থা।

সুরভী ভাবতে ভাবতে ট্রেন চলে এলো। ট্রেনটাতে বেশ ভিড়ও হয়েছে। অনেক সময় সামনের বগিতে লোক কম হয়। সেটা ভেবেই উঠে বসল তাতে। বগিটা একেবারেই ফাঁকা। দুজন লোক বসে আছে ম্রিয়মানভাবে। একটা জড় পদার্থের মতো কি যেন উপুড় হয়ে পড়ে আছে। বিদঘুটে গন্ধ বেরুচ্ছে। যাত্রী দু'জন কি এক অসহায় চাহনিতে চেয়ে আছে সুরভীর দিকে, ভাবখানা যেন- কি বাঁচাধন তুমিও আমাদের মত না জানা হতভাগা। ঢুকে পড়েছ ঢাউস খালি বগিতে।

কিছুক্ষণ পরেই সুরভীর অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল ভ্রাম্যমাণ বগিটিকে ঘিরে। ঐ কালো উপুড় হওয়া ওটা কি? একটু কাছে গিয়ে দেখল একটা জলজ্যান্ত মানুষ পঞ্চাশোর্ধ বয়স, বর্ধিষ্ণু শরীর, মোটাসোটা কোটে ঢাকা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। বিকট গন্ধ, বিচ্ছিরি পরিবেশ। নাওয়া হয়নি হয়ত অনেক কাল, পায়ের অংশ ফোলা, ক্ষতযুক্ত।

ভুলে গেল সে তার ভ্রমণপিয়াসী মনের কথা ভুলে গেল সেদিন রাতের কথা।

চিন্তায় আসন নিল তার আর অসাড় বস্তু মানে উদ্ভট ঐ মানুষটার ইতিকথা।

হতে পারে ও এক পিতা, স্নেহময়ী পিতা অথবা গৃহহারা এক ভবঘুরে। তার জানা ছিল হোমলেস বলে আমেরিকায় একটা কথা আছে। নিজের আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এখানে এক মস্ত বড় সংগ্রাম। মানব জীবন সংগ্রামের। সংগ্রাম স্বপ্ন দেখায়, স্বপ্নই করে সংগ্রামী।

সুরভী বাংলাদেশের মানুষদের দেখেছে। অন্তত ভিখারি একটা চাটাই বেঁধেও আবাসন বানাতে পারে। পারে টিনের কোনে কোনে বেঁধে ঘর বাঁধতে। কিন্তু এই মুল্লুকে সব অ্যাপার্টমেন্ট। মালিক সব ঢাউস ঢাউস রিয়েল স্টেট কোম্পানি। ভাড়া মেলে তাদের অ্যাপার্টমেন্টে। মাসের আয়ের পনেরো আনাই যায় তার ভাড়া গুনতে। আবার এদেশে তাগড়া শরীর হলে জুটবে শক্ত কাজ। শরীরে শক্তি নেই তো কাজও নেই। হতচ্ছাড়া লোকগুলো তাই মালিকের কাছে অলিখিত ক্রীতদাস। ক্রীতদাসের দেশ আমেরিকা। ক্রীতদাসেরাই গড়েছে এই অবকাঠামো। মাথা তুলে তাই রোশনই ছড়াচ্ছে দুনিয়ায়।

বিদঘুটে গন্ধ ছড়ানো লোকটা তাই হোমলেস। রাস্তার ভাষায় বাম। চড়ে বসেছে ট্রেনে, হাতে এক বা দুই বোতল হুইস্কি নিয়ে। ঢেলেছে গলায় সব। অঘোরে ঘুমুচ্ছে। থাকবে ঘুমিয়ে ২/৩ দিন। প্রাকৃতিক কাজ সারবে ট্রেনেই। পুলিশ এসে টেনে নিয়ে যাবে। সুরভী আর ভাবতে পারে না।

দোকানে দোকানে বড় বড় পোস্টার। ফাদার্স ডে, ফুল কেনো, ঘড়ি কেনো, অন্তত একটা না একটা কিছু। অথচ যে লোকটা ট্রেনের বগিতে পড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে পৃথিবী থেকে, সে তো পিতা, সে তো কোনো না কোনো রমণীর হৃদয় পুরুষ। অর্থ নেই, শক্তি নেই সবাই তাকে ছেড়েছে, ঘরছাড়া হয়েছে। অবশ্য পাখির অস্থায়ী বাসার মতো মৌসুম এলে এরা মিলিত হবে, সন্তান আসবে, দুদিন ঘর ঘর খেলা হবে তারপর হয়ত অন্য নারীর প্রতি আসক্তি, মাদকাশক্তি বা ব্যর্থতা ঘরছাড়া করবে। মায়েরা ছেলে মেয়েদের হাত ধরে, আর এক মধ্যবয়সীর ঘরে গিয়ে উঠবে কোর্ট পর্যন্ত গড়াবে, চাইল্ড সাপোর্ট দাও অথবা নাও গড়াতে পারে। চলবে এমন ভাঙা গড়া অহর্নিশি। মাতৃজঠরের দাগ থাকে তাই সন্তানেরা এইটুকু মনে রাখে। পিতার তো কোনো চিহ্ন নেই।

এখন হয়তো উদ্ভট গন্ধ ভরা মানুষটার সন্তানেরা মায়ের নব প্রেমিক আশ্রয়দাতাকে পিতৃ দিবসের ফুল দেবে, চুম্বন দেবে। সুরভী চিন্তা করার চেষ্টা করে, হতভাগার এই পরিণতির জন্য কে দায়ী নিয়তি, নিয়ন্তা না হাতের কানাকড়ি।

ট্রেন এসে গেছে ডিকাল্ড এভিনিউতে। মেয়ের স্কুল, মেয়ে একাই যেতে পারে। তবুও ভয় হয় বাড়ন্ত যৌবনে আদিম হাওয়ায় সে যেন হারিয়ে না যায়। তাই তাকে নিতে আসা। ক্লান্ত মনটা শরীরটাকেও ভারাক্রান্ত করে তোলে, চলতে নড়তে চড়তে ইচ্ছে হয় না। মৌনির 'মা' ডাকে চমকে ওঠে। মৌনির হাতে তাজা গন্ধে বিভোর রক্ত গোলাপ, কিন্তু মা বাবা কই?

- কেন জানো না বাবা এই সময় কাজে যায়?

- জানি

- এটা নাও। ফুলটা হাত বাড়িয়ে দেয়।

- ফুল কেন রে?

জানো না বুঝি আজ, Father`s day। আব্বার জন্য এটা

সুরভী প্রশ্ন করে, আমাকে কিছু দিবি না। মৌনি একটু রেগেই বলে, মা সেই মাদার্স ডে তে যে কাচের চুড়ি কিনে দিয়েছিলাম লাল হলুদ রঙ সে তো তুমি হাতেই দিয়ে আছ।

সুরভী হেসে বলে, সত্যিই তো।

- আরে মৌনি যদি কোনোদিন আমি হারিয়ে যাই, তোর বাবা কি তোর বাবা থাকবে? তোর কি মনে হয় না বিয়ে করে আর এক বাসায় গিয়ে উঠবে না?

মৌনি স্বগোক্তি করে, আমার বাবা, আমার বাবাই-

হাতের চুড়ির টুং টাং শব্দ তুলে ছুটে চলে সুরভী মেয়ের হাত ধরে ফিরতি ট্রেনের দিকে।

ট্রেন এসে গেছে।

গোলাপের গন্ধ, ট্রেনের ঝাঁকুনি, বাহারি কাচের চুড়ির আধেক বোল, মা মেয়ের কথা ভুলিয়ে রাখে জীবনের কঠিন সময়টাকে।

সুফিয়া খন্দকার

32-48-30th street, APt#A2, Astoria

Ny-11106, USA

রিয়াদ

কর্মক্ষেত্রে প্রবাসীদের ভাষা বিভ্রাট

ভাষা ও আচরণের মাঝেই মানুষের প্রকৃত কালচার ফুটে ওঠে। একদা এক আনন্দ ভ্রমণে আমরা ইন্ডিয়ান ও ফিলিপিনো মিলে সাত-আটজন সহকর্মী (বন্ধু) বিশাল এক পাহাড়ের চূড়ায় উঠলাম। উঠতে এক ঘণ্টা সময় লেগেছিল। তবুও উঠতে যতোটা সহজ মনে হলো নামতে কিন্তু অতোটা সহজ ছিল না বরং বিপজ্জনক। কারণ একটু হোঁচট খেলেই খেলা ফাইনাল। ওপর থেকে নিচের মানুষগুলো খুবই ছোট অনুভব হলো। চূড়ায় উঠে দেখি এক নতুন পৃথিবী। ঠিক ছবিতে বা টিভিতে দেখা চাঁদের দেশ বা মঙ্গল গ্রহের মতো। এক বন্ধু রহস্য করে বলল- 'বিজ্ঞানীরা মানুষরে বোকা বানাইছে, পাহাড়ের উপর থেইক্যা ছবি তুইল্যা নিয়া কয় চাঁদের দেশের ছবি। আর এইডা নিয়া পৃথিবী জুড়ে তোলপাড়, বাঙালির চোখে ফাঁকি?' আরেক বন্ধু তাকে উদ্দেশ্য করে বলল- 'এ্যাই তোর বাড়ি কইরে, নোয়াখালী নাহ্?' হাসতে হাসতে জান যায়। তখনো আমরা পাথরের ওপর বসে বসে হাঁপাচ্ছি, রোদ তো টাকের ওপর আছেই। তারপর পাহাড়ের ওপর হাঁটতে হাঁটতে এক বন্ধু সিগারেট ধরালো এবং আমার দিকে এগিয়ে ধরল। ওকেশনাল স্মোকিং। আমিও একটি হাতে নিলাম। আমার পাশেই আরেক বন্ধু ইন্ডিয়ান এক বন্ধুকে বলল- 'তোম্ সিগারেট খায়েগা'। ইন্ডিয়ান বন্ধু জবাব দিল- 'নেহি খাউঙ্গা, ম্যায় পিউঙ্গা'। সহাস্যে হেসে উঠলো সবাই। সে আবার বলল- 'বাঙালি আদমি হামেশা সিগারেট খাতেহেঁয়, পানি খাতেহেঁয়, লেকিন হাম্লোগ পিতেহেঁ। প্রচন্ড বাতাস, তাই সিগারেট জ্বালিয়ে বিপরীতমুখী হয়ে কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম নিলাম। প্রতিবেশী দেশীয় বন্ধুর কথা শুনে একটা কৌতুক মনে পড়ে গেল এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, 'আচ্ছা বলতো কোন জিনিস পৃথিবীর কোথাও খায় না, শুধু বাংলাদেশে খায়'? জবাব নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। সত্যিই বিচলিত হওয়ার মতো বিষয় এবং অপ্রিয় হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে ভাষাগত। এ বিষয়টি চর্চা বা সংশোধনের কোনো পরিকল্পনা বাংলা একাডেমী অথবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এখনো গ্রহণ করেনি। সচরাচর কথোপকথনের পাশাপাশি আমাদের প্রচার মাধ্যমগুলোতে (নাটক)-এর ব্যবহার সর্বদাই দেখা যায়।

শুধু তাই নয়, এ সামান্য ভুল অনেক সময় অসামান্য মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলছি- আমাদের দেশ থেকে প্রতি বছর শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, কম শিক্ষিত, অশিক্ষিত সব মিলিয়ে এক বিশাল আকারের ম্যানপাওয়ার রয়েছে সৌদি আরবে। স্থান বিশেষে কালক্রমে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষীর সঙ্গে ওঠাবসা করতে করতে এক সময় ভাষা চর্চা হয়ে যায় এবং মোটামুটি চলার মতো বা মনের ভাব প্রকাশ করার মতো পরিবেশ গড়ে ওঠে। সে ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড ভাষা বা ব্যাকরণের ব্যবহার প্রয়োজন হয় না। তবুও একই সমস্যা থেকে যায়। না বুঝে বা না জেনে 'পানি খাই' চা খাই' বা 'সিগারেট খাই' এই শব্দগুলোকে ইংরেজীতে Water eating, Tea eating,Cigarette eating ইত্যাদি বলে থাকে। এছাড়া- (I) Eating finishing not come অর্থাৎ বলতে চেয়েছে 'খাওয়ার পরে এখনো আসেনি' (সঠিক He does not come back after meal) (ii) I told manager now taday অর্থাৎ 'আমি এখনি ম্যানেজারকে বলবো' (সঠিক I will inform to the manager, now.) এভাবে ইংরেজি বলে থাকে। বাংলা শব্দের সঙ্গে ইংরেজি শব্দগুলো হুবহু বসিয়ে দেয়ার এ কৌশল প্রয়োগের ফলে অন্যরা কোনো রকমের কপটতা ছাড়াই বুঝে নেয়। কিন্তু মূলত আমরা শেখার বা বোঝার আদৌ চেষ্টা করি না। টাকার জন্যে বিদেশে এসেছি, গ্রামার দিয়ে কি হবে, বোঝাতে পারলেই চলে- এটাই মনে করি। কাজেই ব্যক্তি ও অবস্থা বুঝে এপ্রোজ বলতে হয় এবং শিক্ষিতদের ক্ষেত্রে এটা অপচর্চা ও অনেক সময় বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অধিবাসীরা যতটুকু পারে বেশ ভালো ইংরেজি বলে বা সঠিকভাবে বলার চেষ্টা

লন্ডন

বৈচিত্র্যহীন এই লন্ডন

আজ ১ মাস হতে চলল আমি এই লন্ডন শহরে আছি। এখানকার একটা ইউনিভার্সিটিতে এমবিএ করার জন্য আমার লন্ডন আসা। অথচ আমার এখানে আসার কথা ছিল না। একেবারেই মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে আমি। ওয়েব সাইটে একটা ভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নেয়ার জন্য একবার ব্রিটিশ হাইকমিশনে দাঁড়াই। দেখলাম আমার ভিসা হয়ে গেল। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানি ছাড়া এ আর কিছুই হতে পারে না। অথচ আমার অনেক বন্ধু আছে যার বাবারা কোটিপতি, অথচ তাদের ভিসা হয়নি। যাক অনিচ্ছা সত্ত্বেও লন্ডনে এসে দেখলাম এটা কি মানুষের শহর না রোবটের শহর। সব মানুষ দেখলাম এক একটা রোবট। সবাই যার যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। কেউ কারো দিকে ফিরেও তাকায় না। তাদের মধ্যে খুঁজে পাইনি আমি কোনো প্রেম-ভালোবাসা, হৃদয়ের কোনো আবেগ। খুব কষ্ট লাগে যখন অনুভব করি আমি আমার বাবা-মায়ের স্নেহভালোবাসা থেকে বিচ্ছিন্ন-কোথায় পাব মায়ের সেই ভুবন ভোলানো হাসি, বোনের হাসিমাখা সেই মুখ, কিছুই নেই এখানে। যেন শুধু মরুভূমি, খব কান্না পায়, তখন ভাবি কেন এলাম এই মরুভূমিতে, এর চেয়েতো সেই ভালো ছিল। আমার গ্রামের রাস্তাঘাট, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা। হয়তো একটা কেরানির চাকরি করতাম। কিন্তু সেটাই আমার কাছে বরং ভালো লাগতো। কারণ আমি মনে করতাম, আমি আমার মা, আমার মাতৃভূমির কাছে আছি। অথচ এখন সবকিছু মনে হয় অচেনা। আমাদের দেশের মানুষ মনে করে লন্ডন কতই না একটা সুখের জায়গা। মাঝে মাঝে দেখি মানুষ কি পরিশ্রমই না করছে এখানে এসে। অবৈধভাবে এসে কত মানুষ যে এখানে বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। তবে এখানে একটি জিনিস দেখলাম, সেটা হলো আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, একজনের বিপদে এগিয়ে আসা। আবার কিছু খারাপ দিকও রয়েছে এখানে। আমাদের দেশের কতিপয় তথাকথিত মর্ডান ছেলেমেয়ে দেখলাম পশ্চিমা ধাচে নিজেদের তৈরি করেছে। তাদের পোশাক-আশাক, চলাফেরা সবই ঐ ধাঁচের। এরা নিজেদের আধুনিক বলে পরিচয় দেয়। এদের দেখলে যে কারোরই মাথা খারাপ হয়ে যাবে। আমাদের মতো মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা এখানে এসে খাপ খাওয়াতে পারে না। ফলে আমাদের থাকতে হয় বন্ধুহীন। পরিশেষে শুধু এটাই বলব, ভাইরে লন্ডনে কোনো লাইফ নাই। আমাদের মতো ফ্যামিলির যারা, তারা এখানে এসো না। তারচেয়ে বরং দেশে মা-বাবার ভালোবাসায় বড় হও। হয়তো অর্থ উপার্জন করতে পারবে, কিন্তু অর্থই কি সব? স্নেহ-ভালোবাসার কি কোনো দাম নেই?

Md.Shamsul Arafin (Dalim)
9, Langdon Crescent, London, Eastham, E62pw, UK
Tel : 07863157420 (mobial), 0208548939 (TNT)

করে, তারা বেশির ভাগই Speaking-এ দক্ষ। ইন্ডিয়ানদের ইংরেজি বেশ ক্লিয়ার, মনে হয় যেন মুখে খই ফোটে। বিশেষ করে আমাদের জন্য উচ্চারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু আমরা শিক্ষিত হলেও স্পিকিংয়ে বেশ দুর্বল। অশিক্ষিত শ্রমিকদের কথা বাদই দিলাম, গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা প্রাথমিকভাবে এসে একটি বাক্যও ঠোঁটে আনতে পারে না। স্পিকিংয়ে পারদর্শীর সংখ্যা খুবই কম। স্থানীয় ভাষা পরের ব্যাপার, প্রথমে অন্তত ইংরেজিতে কথা বলাটা আবশ্যক। কাজেই শিক্ষিত হলেও অশিক্ষিতের পরিচয় মেলে এবং কপালদোষে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শ্রমিকের কাজ করতে হয়। বর্তমান চাপাবাজির যুগে ইংরেজিতে একটু চাপা মারতে পারলে এ দেশে অফিসে ভালো চাকরি পেতে অসুবিধা হয় না।

আমাদের এ অবস্থা নিরসন হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান চারদলীয় জোটের একটা বিরাট সাফল্য ও ভূমিকা রয়েছে। সেই সূত্র ধরে যদি কমপক্ষে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে শুরু করে প্রতিটি শ্রেণীতে ইংরেজির পাশাপাশি স্পোকেনের ওপর একটি আবশ্যক অথবা ঐচ্ছিক বিষয় থাকে তাহলে আমরা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট অর্জন না করেও বিদেশে অন্তত 'মূর্খ শিক্ষিত' হওয়ার লজ্জা থেকে মুক্তি পেতাম।

আমি যখন ডিগ্রিতে পড়ি, সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদ সরকারের বদৌলতে তখন ডিগ্রিতে ইংরেজি বিষয় আবশ্যক ছিল না। তাই আমাদের হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রিয় শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার একদিন বলেছিলেন যে, তোমরা মূর্খ শিক্ষিত। বিদেশে আমাদের স্পোকেনের অবস্থা সেই বিষয়টিই স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে হ্যাঁ, এটা অন্তত জোর গলায় বলতে পারি যে, আমরা কোরিয়ানদের চেয়ে কিছুটা হলেও ইংরেজিতে উন্নত। কারণ আমরা (বাংলাদেশীরা) বাংলা প্রতিটি শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে ইংরেজি শব্দ বসিয়ে কথা বলতে পারি কিন্তু কোরিয়ানরা ইংরেজি, আরবি। কোরিয়ান ভাষা মিলিয়ে কথা বলে। তবে সবাই নয়, কম শিক্ষিত যারা তারাই এভাবে এপ্রোজ করে। যেমন- 'এভাবে ভালোমতো ঘোরালে বেরিয়ে আসবে' এ বাক্যটাকে এক কোরিয়ান বলল- (হাত ঘুরিয়ে) 'ইরিকি ইরিকি ডুইং মাফি কামিং ইপো নো গুশা ইম্মা-আ-আ-' (সঠিক ইংরেজি- It will come out if you revolved this way/Revolve properly by this way to come it out.) এবং পুরোপুরি যদি ইংরেজি ব্যবহার করে তাহলে এমন- Who man Telephone many many (Means : Who is Phoning too much?) অর্থাৎ জানতে চেয়েছে 'কে বারবার ফোন করে'। শিক্ষিত অনেক কোরিয়ান আছে ইংরেজিতে দরখাস্ত বা চিঠি লিখতে পারে না। আবার অর্ধশিক্ষিত হলেও অনেকে শিক্ষিতের চেয়ার দখল করে বসে এবং স্পিকিংয়ে নমুনা হল- 'Your company delivery no sending case our company receive impossible' অর্থাৎ বলতে চেয়েছে যে, আপনি মাল না পাঠালে আমরা কিভাবে পাব (How shall we get the materials if you don't delivered?)। আরেকটা বাক্য- 'why delivery materials your company no sending to our company' অর্থাৎ 'মাল এখনো পাঠাননি কেন' (Why don't you delivered the materials yet?)। কাজেই তাদের সঙ্গে ঠিক এভাবেই তাল মিলিয়ে কথা বলতে হয় এবং (যতটুকু জানি) তাতে আমাদের জানা ন্যূনতম Grammatical English টুকুই হারিয়ে ফেলি। ফলে Eating finishing (ইটিং ফিনিশিং) এর মতো আমাদের Grammer finishing (গ্রামার ফিনিশিং) হয়ে যায়। তবে বহির্বিশ্বের সঙ্গে চলতে গেলে ইংরেজি ভাষা অত্যাবশ্যক, কোনো সন্দেহ নেই।

গত আনুমানিক চার-পাঁচ বছর আগে ভারতের নির্বাচন কমিশনের একটি তথ্যে বলা হয়েছিল যে, ভারতের সব রাজনীতিবিদদের নির্বাচনে প্রার্থী হতে হলে অবশ্যই ন্যূনতম যোগ্যতা গ্র্যাজুয়েট ও ক্রাইম বহির্ভূত হতে হবে এবং এটা ব্যাপক হারে জনমত স্বীকৃত। কিন্তু বর্তমানে অনেক বিজ্ঞ ও প্রবীণ রাজনীতিবিদ দেশের শীর্ষস্থানে রয়েছে বিধায় ধীরে ধীরে ক্রমানুসারে গ্রাজুয়েট রাজনীতিবিদদের স্থানান্তর করা হচ্ছে এবং আগামী নির্বাচনগুলোতে মোটামুটি সফল চর্চা হবে বলে আশা প্রকাশ করেছে। শুধু তাই নয়, ভারতীয় ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রেও এরূপ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। যেহেতু এটা সম্পূর্ণ মেধা ও প্রতিভার বিষয়, সেহেতু ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে জানানো হয়েছে যে, প্রত্যেক ক্রিকেটারকে বোর্ডের নিজস্ব উদ্যোগে স্পোকেনের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য যাতে করে বিদেশের মাটিতে কেউ না বলতে পারে যে, আই ক্যান নট স্পিক ইংলিশ (I cannot speak English)। আমাদের দেশেও এ ধরনের নিয়ম চালু করা উচিত।

পৃথিবীর সব দেশেই ভাষা শিক্ষার ওপর বেশ গুরুত্ব দেয়া হয়। তবে আমাদের মাতৃভাষার মাঝে সম্প্রতি বানানের ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার প্রায় নজরেই পড়ে না। যুগ্ম শব্দও পরিবর্তন হচ্ছে। গত ১০ অক্টোবর ২০০৩ তারিখে দৈনিক ইনকিলাবে জোট সরকারের দু'বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যায় লিখিত বিভিন্ন বিজ্ঞ ও খ্যাতিমান কলামিস্ট- সিরাজুর রহমান, নূরুল আলম শাহীন, সুলতান মাহমুদ প্রমুখ ব্যক্তির লেখা পড়েছিলাম। সেখানে কিছু কিছু শব্দের বানান আমার দৃষ্টিতে নতুন মনে হলো। যেমন- রিকশা, মাদরাসা, অধোপতন, বাইর, এপৃল, যথাশিগগির ইত্যাদি শব্দাবলী- যা পূর্ব থেকেই দেখে আসছি যথাক্রমে রিকশা, মাদ্রাসা, অধঃপতন, বাহির এপ্রিল, যথাশীঘ্রই। জানি না, হয়তো আমারই ভুল। তবে শুনেছি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তথা বাংলা একাডেমী থেকে প্রতি বছর ভাষাগত তারতম্যের ভিত্তিতে বানান, উচ্চারণসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়। কিন্তু আমরা প্রবাসীরা এ বিষয়ে তেমন একটা জানতে পারি না। যাই হোক, মাতৃভাষাটা না হয় মানিয়ে নিলাম কিন্তু স্পোকেন ইংলিশ দেশের বাহিরে খুব বেশি জরুরি।

সম্প্রতি পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, জাতীয় শিক্ষা কমিশন ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ঐকমত্যের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। প্রবাসীদের পক্ষ থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই এবং আমরা আশাবাদী যে, এটা বাস্তবায়ন হলে অদূর ভবিষ্যতে অবশ্যই বাংলাদেশী প্রবাসীরা ভাষা বিভ্রাট থেকে মুক্তি পাবে। তবে তার আগে ইংরেজি শিক্ষার মূল দোরগোড় বা ইং-শিক্ষাকে মজবুত করার নিমিত্তে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও বিশেষভাবে কর্তৃপক্ষের গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য সবার হয় না।

আইয়ুব আহমেদ দুলাল
রিয়াদ, সৌদি আরব
E-mail-ayubalibd@hotmail.com

প্র বা সী দে র প্র তি

প্রবাস জীবন তুলে ধরবে প্রবাসী বাঙালীদের জীবযাপন মনন চেতনার চালচিত্র। প্রবাসীদের সঙ্গে এ সংযোগটা আমরা চাচ্ছি। প্রবাসীদের অনেকেই তথ্যভিত্তিক লেখা লিখছেন। কিন্তু আমরা চাচ্ছি আপনারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখুন। লিখুন পরবাসী জীবনের নানা বৈচিত্র্যময় ও বর্ণময় কাহিনী। লিখুন দূতাবাস সমস্যা। ইমিগ্রেশনের নিয়মকানুন, সন্তানের শিক্ষা, বিদেশী বন্ধু বা বান্ধবীর কথা। ২০০০-এর দেশের পাঠকরা দেশে বসে প্রবাসকে পুরোপুরি জানতে চায়। আপনারা লিখুন। সঙ্গে ছবি দিন। ছবি আপনার লেখাকে সমৃদ্ধ করবে। সম্পূর্ণ ঠিকানা (ফোন ই-মেইলসহ) দিতে ভুলবেন না এমনকি ঠিকানা না ছাপতে চাইলেও।- **বিভাগীয় সম্পাদক**

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ
প্রবাস জীবন
The Shaptahik 2000
96/97 New Eskaton Road
Dhaka-1000, Bangladesh.